BL College Journal

ISSN 2664-228X
Volume -1, Issue-2, 2019
pp. 98-106

গালির সমাজতত্ত্ব : শ্রেণি, পেশা ও জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত

ড. খ. ম. রেজাউল করিম
সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, সরকারি মাইকেল মধুসূদন কলেজ, যশোর, বাংলাদেশ
ই-মেইল : rezakarim.km@gmail.com

মহসিন মিঞা
সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, সরকারি জয়বাংলা কলেজ, খুলনা, বাংলাদেশ
ই-মেইল : m.mia2705@gmail.com

সারসংক্ষেপ

সমাজবিজ্ঞানীদের ভাষায় সামাজিক প্রক্রিয়া মানবজীবনের জন্য অপরিহার্য। এ প্রক্রিয়ার অন্যতম বিষয় হলো দ্বন্দ্ব। আর দ্বন্দ্বের মূল উপাদান গালাগাল। এটি মূলত ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ উত্তেজিত অবস্থায় একজন ব্যক্তি এমন সব শব্দ ব্যবহার করে যা সে স্বাভাবিক অবস্থায় করে না, তা গালি হিসেবে চিহ্নিত। অন্যান্য সমাজের মতো বাঙালি সমাজে নানা ক্ষেত্রে গালাগালের প্রচলন লক্ষ করা যায়। সাধারণত ব্যক্তি অভ্যাসবশত, রাগান্বিত হয়ে, হাসি-ঠাট্টাচ্ছলে কিংবা আবেগের মুহূর্তে অন্যকে গালাগাল করে থাকেন। গালাগাল স্থান-কাল-পাত্রভেদে পরিবর্তিত হয়। সামাজিকভাবে গালাগালকে বিচ্যুতির পর্যায়ে মনে করা হয়। মূলত বাঙালি সমাজে গালাগালের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তবে গালাগাল নিয়ে সামাজিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে লেখালেখি ও গবেষণা তেমন একটা চোখে পড়ে না। সঙ্গত কারণেই বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় হিসেবে সামাজিক দৃষ্টিতে গালাগালকে নির্বাচন করা হয়েছে।

১. অবতরণিকা

সাধারণভাবে বলা যায় যে, সমাজবিজ্ঞান হলো সামাজিক সম্পর্কের বিজ্ঞান। এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার বলেন, 'সমাজবিজ্ঞানই একমাত্র বিজ্ঞান যা সমাজ ও সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে পাঠ করে'।[১] আমরা যে সব সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে জীবনযাপন করি, তাদের সংগঠিত রূপই সমাজ। সমাজে বসবাস করার মাধ্যমে মানুষ সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সাথে বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ক স্থাপন করে, যা তাকে সামাজিক জীবের স্বীকৃতি এনে দেয়। আর সামাজিক জীব হিসেবে মানুষকে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে চলতে হয়। এই পথ পরিক্রমায় সামাজিক সম্পর্ক ও বোঝাপড়া সব সময় এক রকম হয় না। এ সম্পর্ক ইতিবাচক হওয়ার পাশাপাশি নেতিবাচকও হতে পারে। যখন কোনো ব্যক্তি অন্যজনের আচরণে ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত হয়, তখন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার

জন্য কিছু শব্দ উচ্চারণ করে, যা অন্যের কাছে অশ্রাব্য, অশালীন, অগ্রহণযোগ্য বা মানহানিকর বলে প্রতীয়মান হয়। এ ধরনের অপ্রত্যাশিত শব্দাবলিই সামাজিক বিবেচনায় গালাগাল হিসেবে স্বীকৃত, যা প্রতিপক্ষের ওপর প্রতিশোধ নেয়া বা ক্ষোভ মেটানোর সবচেয়ে সহজ পন্থা হিসেবে বিবেচিত। বাঙালি জীবনের সাথেও ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে গালাগাল, যা গবেষক, সাহিত্যিক ও সামাজিকবিজ্ঞানীদের কাছে আগ্রহের বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বর্তমান প্রবন্ধে বাঙালি জীবনে ব্যবহৃত গালির শ্রেণি-পেশা ও জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

২. সমস্যার বিবৃতি

বাঙালি জীবনে গালাগালের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, যুবক বা বৃদ্ধ এমন কাউকে পাওয়া যাবে না যিনি জীবনে গালি দেননি। এমনকি বাংলা ভাষায় গালাগাল নিয়ে যত গান, কবিতা, গল্প আছে, গলাগলি নিয়ে তার অর্ধেকও নেই। বাঙালির জীবনে গালি, মরণে গালি, মরণোত্তর গালি, জগৎ সংসারে যেন গালিরই খেলা।[২] বলা হয় সমাজস্থ যে কোনো বিষয়ের সামাজিক উপযোগিতা না থাকলে তা সমাজে টিকে থাকে না। যেহেতু বহুকাল ধরেই বাঙালি সমাজে গালাগাল টিকে আছে, সেহেতু এর কিছু সামাজিক উপযোগিতা রয়েছে। যখন কেউ অন্যকে গালাগাল দেয় তখন তার রাগ বা ক্ষোভ তাৎক্ষণিকভাবে কিছুটা প্রশমিত হয় বলেই ঘটনা পরবর্তী ধাপে পৌঁছায় না। আর গালাগালে রাগ বা ক্ষোভ না মিটলে তা পরবর্তী ধাপে অর্থাৎ হাতাহাতি বা মারামারি পর্যায়ে গড়ায়। তবে শুধু যে বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতিতেই গালাগালের ব্যবহার হয় তাও নয়। অনেক সময় বন্ধুত্বপূর্ণ ও আবেগঘন পরিস্থিতিতেও অনেকে গালাগালের যথেচ্ছ ব্যবহার করে থাকেন। আবার অনেকের পেশাগত সাফল্যে গালাগাল নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে।

গালাগাল এক ধরনের মানসিক প্রশান্তি বয়ে আনে। যেমন- আপনি কাউকে অপছন্দ করেন, কাউকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে পারছেন না। ঠিক এমন সময় তার নামে কিছু গালি উৎসর্গ করুন। দেখবেন কেমন যেন সুখানুভূতিতে মন ভরে উঠছে। সাধারণত বিরক্তি, ক্ষোভ, ক্রোধ, ধিক্কার, অসন্তোষ বা রাগ প্রকাশের ক্ষেত্রে গালাগাল ব্যবহৃত হয়। পাশাপাশি ভালোবাসা ও আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রেও গালাগালের জুড়ি নেই। এক গবেষণায় দেখা গেছে, বেশির ভাগ পুরুষই তার স্ত্রী বা প্রিয়তমার সাথে যৌনমিলনের চরম মুহূর্তে একে অপরের উদ্দেশ্যে অশালীন শব্দ বা গালাগাল ছুড়ে দেয়। এতে তাদের মানসিক ও শারীরিক উত্তেজনা অনেকগুণ বেড়ে যায় বলে ধারণা করা হয়। উদাহরণ হিসেবে জেমস জয়েস ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যকার পত্রগুলো পড়লে বোঝা যায় যে তাঁদের ভালোবাসা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম ছিল গালাগাল। আবার বাঙালি সমাজে এক ধরনের আত্মীয় বা জ্ঞাতি লক্ষ করা যায়, যাদেরকে বলা হয় কৌতুক সম্পর্কীয় জ্ঞাতি। এটি এমন সম্পর্ক যেখানে একজন প্রথা অনুসারে এমনকি কখনো বাধ্য হয়ে অপরের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, যার জন্য অপর ব্যক্তি কোনো রাগ প্রদর্শন করতে পারে না বা অপরাধ হিসেবে গ্রহণ করে না।[৩] যেমন- নানা-নাতি, দাদা-নাতি, শালা-ভগ্নিপতি, দেবর-ভাবী

ইত্যাদি। অনেক সময় নানা কিংবা দাদা বা নানা সম্পর্কের মুরুব্বিরা নাতি-নাতনি সম্পর্কের ছেলে-মেয়েদের গালাগাল দিয়ে মজা পান। আবার ছোট বাচ্চাদের আদর করে ডাকা হয়-বান্দর, হনুমান, পাজি, শয়তান, বিচ্ছু, বুদ্ধু, বোকা ইত্যাদি। অনেকে স্রেফ মজা করার জন্য সচেতনভাবেই পরিবারে বা বন্ধুমহলে গালাগাল প্রয়োগ করে থাকেন। তাই বলা হয় 'humors are nothing but slang'। সুতরাং দেখা যায়, গালি ভাষার নতুন এক উপযোগ সৃষ্টি সাপেক্ষে মানুষের জীবনে রসের সঞ্চার করেছে, যা মানবজীবনের জন্য অনেকটাই অপরিহার্য।

৩. গালাগাল কী

গালাগাল শব্দটির প্রতিশব্দ হলো গালিগালাজ, গালমন্দ, ভৎর্সনা, তিরস্কার, গালিপাড়া, গালিবর্ষণ, গালি, বদকথা, কটুকথা, অপকথা, বকাঝকা, কুকথা, অশ্লীল শব্দ, অশিষ্ট শব্দ, কটুকাটব্য প্রয়োগ ইত্যাদি। গালি শব্দটির পারস্পরিক অর্থবাচকতা আছে। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি যদি অন্যজনকে গালি দেয় এবং অপরজন যদি তার প্রতিত্তরে গালি দেয় তখন তা পরিণত হয় গালাগালিতে। খানিকটা হাতাহাতি, লাঠালাঠি ও চুলাচুলির মতো বিষয়। আর যখন গালাগাল একপাক্ষিক হয় তখন তাকে গালি বলা হয়। যেমন-শিশুরা অনেক সময় বাবা-মার কাছে অভিযোগ করে যে, 'অমুক আমাকে গালি দিয়েছে।' The Historical Dictionary of American-তে গালির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হচ্ছে, 'Slang is lexical innovation within a particular cultural context.'[৪] আবার গলাগলি ও গালাগাল শব্দ দুটির মধ্যে ধ্বনিগত কিছু মিল থাকলেও অর্থ একবারেই বিপরীত। গলাগলি দ্বারা দুইজন ব্যক্তির গলায় গলায় ভাব বা মধুর সম্পর্ককে বোঝানো হয়। কিন্তু গালাগাল সেই ভাবের ঠিক বিপরীত অবস্থা। বরং ভাবের পরিবর্তে যখন অসদ্ভাব তৈরি হয় তখনই একজন অন্যজনকে গালি দেয়। গালি মূলত ক্ষোভ বা রাগ প্রকাশের প্রাথমিক অস্ত্র। যখন মানুষ নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তখনই গালি দিয়ে থাকে। তাই বলা হয় গালাগালের পরবর্তী ধাপ হলো হাতাহাতি/মারামারি।[৫]

৪. প্রবন্ধের উদ্দেশ্য

বর্তমান প্রবন্ধের সাধারণ উদ্দেশ্য হল গালাগালের পরিপ্রেক্ষিত ও বাঙালি সমাজে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করা। এই উদ্দেশ্যকে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হল-

ক) দেশে প্রচলিত গালাগাল অনুসন্ধান করা;
খ) গালাগালের শ্রেণি-পেশা ও জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরা;
গ) সমাজে গালাগালের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব নির্ণয় করা;

৫. পদ্ধতি

বর্তমান প্রবন্ধটি মূলত উদঘাটনমূলক (exploratory)। এ প্রবন্ধ বিষয়ক তথ্যের জন্য মুখ্য ও গৌণ উভয় প্রকারের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। মুখ্য তথ্য সংগ্রহের জন্য সমাজের নানা পেশা-শ্রেণির

(শিক্ষক, ছাত্র, বাস-ট্রাক শ্রমিক, রিকশা-ভ্যানওয়ালা, কুলি, কাঠমিস্ত্রী ইত্যাদি) মানুষের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। আর গৌণ তথ্যাদি বিভিন্ন গ্রন্থ, জার্নাল, ম্যাগাজিন, স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক পত্র-পত্রিকা, বিভিন্ন ওয়েবসাইট ইত্যাদি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণা সংশ্লিষ্ট সংগৃহীত তথ্যাবলি যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণের পর তা বর্ণনামূলকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৬. বিষয়বস্তুর মূল আলোচনা

মানুষকে তার বৈচিত্র্যময় অনুভূতির প্রকাশ ঘটাতে বিভিন্ন ধরনের রূপকের আশ্রয় নিতে হয়। তাই গালি হচ্ছে ভাষার মেটাফরিক উপস্থাপন। যেমন-সে আস্ত একটা গাধা, লোকটি কুত্তার মতো ঘেউ ঘেউ করছে। পেট হাগস-এর মতে, Slang is non-standard language that usually represents vocabulary related to popular culture।[৬] কে. জি. চেস্টারসন বলেছেন, all slang is metaphor and all metaphor is poetry'।[৭] গালি মানব মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তবে ক্ষেত্রবিশেষ এর প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। জানা যায়, মানুষ যেদিন থেকে ভাষা আয়ত্ত করতে শিখেছে সেদিন থেকেই গালির ব্যবহার শুরু হয়েছে। রাগ, ক্ষোভ, দ্বেষ, হিংসা কিংবা অপরাধের শাস্তি হিসেবে অপরাধীকে তিরস্কার করতে গালির ব্যবহার হয়ে আসছে সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই। গালির কার্যকারণ যা-ই থাকুক না কেন, সেই আদিম সমাজ থেকে বর্তমান উত্তরাধুনিক সমাজ পর্যন্ত এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তাই লক্ষ করা যায় ধর্ম, বর্ণ, পেশা, বৃত্তি, কৌম, সমাজ, পৃথিবীর সব ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে গালাগালের ব্যবহার ও চর্চা রয়েছে। এই গালাগালের ধরন আবার সমাজ ও সংস্কৃতিভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। সমাজের এক স্থানের বুলি অন্যস্থানে গালি হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন, যুক্তরাজ্যে fag মানে সিগারেট, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে fag বলতে হোমোসেক্সুয়াল পুরুষকে বোঝায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে 'খাসি' শব্দটা ইতিবাচক হিসেবে ব্যবহার করা হলেও মেহেরপুর জেলায় এটি গালি হিসাবে বিবেচিত। আবার বন্ধুদের আড্ডায় শালা, খানকির ছেলে, গাধা, কুত্তা, শুয়োর এ জাতীয় শব্দ গালি মনে না হলেও বড়দের মাঝে আনুষ্ঠানিক কোনো বৈঠকে তা গালি হিসাবে গণ্য করা হয়। আবার জেন্ডার ভেদেও গালির ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। যেমন, দেশে নিম্নশ্রেণির মানুষেরা মাগি, ভাতার, নাঙ, মিনসে শব্দগুলো স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করে কিন্তু এই শব্দগুলো শিক্ষিত সমাজে গালি হিসাবে বিবেচিত। পুরুষদের আড্ডায় অনেক শব্দ ব্যবহার করা হয়, যা নারীমহলে গালি হিসেবে চিহ্নিত। যেমন, হুদায়, চোদনা, বাড়া, বকচোদ, ভোদাই ইত্যাদি।

গালি হিসেবে যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়, তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তার বেশির ভাগই এসেছে প্রাণি বা নিম্নশ্রেণির জীব থেকে, যেমন- কুত্তা, গাধা, পাঠা, শুয়োর, ছুঁচো, পেঁচা, গরু, ছাগল, মহিষ, বান্দর, হনুমান ইত্যাদি; কিছু এসেছে নেতিবাচক শব্দ থেকে, যেমন- ফালতু, রোগা, মূর্খ, বোকা, হাঁদা, মরণ, পচা, চাষা, কলু, জোলা ইত্যাদি; কিছু এসেছে রোগের নাম এবং শারীরিক

ক্রটি থেকে, যেমন- পাগল, বসন্ত, মৃগী, জিনে ধরা, কানা, ন্যাড়া, কালা ইত্যাদি; কিছু এসেছে নিম্নশ্রেণির পেশা থেকে, যেমন- চোর, ডাকাত, কুলি, চামার, মুটে, মুচি, নাপিত, মেথর ইত্যাদি; কিছু এসেছে সম্পর্ক থেকে, যেমন- শালা, শালী, সতীন, মর্দা ইত্যাদি; কিছু এসেছে মানুষের যৌনাঙ্গ থেকে, যেমন- বাল, বাড়া, ভোদা, ভোদার বাল, ধোন, ধোনের বাল, হোল, হোলের বাল, চ্যাটের বাল ইত্যাদি; অনেক সময় বিদেশি শব্দ থেকেও গালি আসে, যেমন- হারামি, মাদার-ফাকার, হেল, বাস্টার্ড, ফ্রড, বিটার, শয়তান, কামিনে, ফাজিল, জালিম, কাফের; কিছু গালি এসেছে ইতিহাস এবং পুরাণের পাতা থেকে, যেমন- নমরুদ, ফেরাউন, হিটলার, মীরজাফর, রাজাকার, আলবদর ইত্যাদি। এছাড়া অনেক শব্দ উৎপত্তিগত অর্থে অশালীন না হলেও প্রয়োগের কারণে তা গালি হিসাবে গণ্য করা হয় যেমন, মাগী। শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে তিরিশোর্ধ মহিলা। তবে প্রায়োগিক অর্থে খারাপ স্বভাবের নারী বা পতিতার সমার্থক হিসেবে মনে করা হয়।

গালি বলতে যে সবসময় অশালীন শব্দকে বোঝানো হয় বিষয়টি ঠিক তা নয়। এটা নির্ভর করে শব্দটাকে কিভাবে, কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে তার ওপর। যেমন অশালীন শব্দ প্রয়োগের কারণে গালি হিসেবে গণ্য নাও হতে পারে, তেমনি শ্লীল শব্দ ব্যবহারের মারপ্যাচে গালাগাল হিসেবে গণ্য হতে পারে। যেমন, যখন বলা হয়, বেশ্যালয় গমনে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। তখন বেশ্যা শব্দটি গালি হিসাবে ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু যখন বলা হয়, তুই একটা বেশ্যার জাত, তখন বেশ্যা শব্দটা গালি হিসাবে বিবেচিত হয়। শিক্ষিত মানুষের কথার মারপ্যাচে গালি দেওয়ার প্রবণতা অধিক লক্ষ করা যায়। যেমন, ক্রিকেট মাঠে রড মার্শ একবার ইয়ান বোথামকে বলেছিলেন, 'হায় ইয়ান, তোমার বউ আর আমার বাচ্চারা কেমন আছে?' জবাবে বোথাম বলেছিলেন, 'বউ ভালোই আছে কিন্তু বাচ্চারা সব বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মেছে দেখছি।'[৮]

৭. গালাগালের জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত

পুরুষ শাসিত সমাজে নারীকে যে দৃষ্টিতে দেখা হয় তার প্রতিফলনও ঘটে ভাষার মাধ্যমে। ভাষা অনেক সময় জেন্ডার এজেন্ট হিসেবেও কাজ করে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত গালাগালগুলোর দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, গালিগুলো সুস্পষ্টভাবে পুরুষত্বের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করছে। সমাজে মাগি মানুষ, ছেনাল, নটি, বেশ্যা, বেশ্যা মাগী, নটি মাগী, অসতী, শালী, অবলা, অপয়া, চুন্নি, খানকি, পাগলী, ছলনাময়ী, সর্বনাশী, পাড়াবেড়ানি, চুতমারানি, বারানি, চাকরানী, ফকিন্নি, বেজাত ইত্যাদি। কথায় কথায় বলতে শোনা যায়, তোর জন্মের ঠিক নেই, বেশ্যার ছাওয়াল এ গালিগুলো সামগ্রিকভাবে নারী জাতিকে সামাজিকভাবে হেয় করে।

গালাগালের শব্দমালা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বেশিরভাগ শব্দই নারীকেন্দ্রিক বা নারীর সংবেদনশীল অঙ্গকে ফোকাস করে। এতে বোঝা যায় নারীর মর্যাদায় আঘাত করলেই কেবল ক্ষোভ প্রশমন বা প্রতিশোধ নেয়ার কৌশল অবলম্বন করা হয়। যুদ্ধের সময় যেমন শত্রুপক্ষ নারী ধর্ষণকে অন্যতম প্রধান অস্ত্র হিসেবে মনে করে, তেমনি মৌখিক বিরোধে প্রতিপক্ষ গালিতে যে শব্দ সমষ্টি

ব্যবহার করে তার অনেকটাই নারী বিষয়ক। যেমন খানকির ছেলে/মেয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঐ ব্যক্তির মাকে বা মায়ের চরিত্র নিয়ে অপমানসূচক শব্দ উচ্চারিত হয়, যা ব্যক্তির মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে। ফলে সে মানসিকভাবেই খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়ে। এভাবে অন্যকে দুর্বল করার মাধ্যমে নিজের ক্ষোভ প্রশমন করা হয়। আসলে গালাগালের ক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিকতা রয়েছে। যাদের মুখ দিয়ে গালি বের হয় তাদের বেশিরভাগই পুরুষ তারা হয়ত সচেতনভাবেই নারীদের জন্য গালি তৈরি করে নিজেকে অপমানের সুযোগ দিতে চায় না।

৮. শ্রেণিগত গালাগাল

সমাজে অর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্যের কারণে গালির পার্থক্য ঘটে থাকে। অবশ্যই অর্থনীতি অন্য সবকিছু নির্ধারণের পাশাপাশি মানুষের ভাষাও নির্ধারণ করে থাকে। সমাজের নিম্নমধ্যবিত্ত বা শ্রমিক শ্রেণিকে তুচ্ছার্থে নানাবিধ গালি ব্যবহার করা হয়। সাধারণত শ্রমিক শ্রেণির সাথে মালিক শ্রেণিরা খুব অকথ্য ভাষায় কথা বলে। এমনকি চাকর, রিকশাচালক, মুটে, কুলি-মজুর সবাই এই ভাষা বৈষম্যের শিকার হয়।

৯. পেশাগত গালাগাল

গভীরভাবে খেয়াল করলে গালির একটা পেশাগত প্রেক্ষাপটও পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন পেশাজীবীদের অবলীলায় গালি ব্যবহার করতে দেখা যায়। তবে সকল পেশার মানুষদের মুখে গালির ব্যবহার একই হারে হয় না, বরং পেশাভেদে কম বেশি হতে দেখা যায়। যেমন-মসজিদের ইমাম বা মন্দিরের পুরোহিতের মুখ দিয়ে গালি বের হওয়া নেহাত দুর্ঘটনা। আবার বাসের চালক, হেলপার, সুপারভাইজার, ঘাটের কুলিদের মুখে গালি না থাকাটাই অস্বাভাবিক। দেশে পুলিশতো গালিকে পেশাগত অস্ত্রে পরিণত করেন বলেই অনেকের ধারণা। আবার গালির শব্দভাণ্ডারে পেশাগত বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। প্রত্যেক পেশায় স্বতন্ত্র গালি আছে যা শুধু নিজেদের পরিমণ্ডলেই ব্যবহার হয়ে থাকে। অনেক পেশায় কঠিন কায়িক শ্রম দিতে হয়। সেখানে শ্রমিকরা কোন ক্ষোভ নয় বরং সর্বশক্তিতে জেগে ওঠা বা শক্তি বৃদ্ধির জন্য গালির ব্যবহার করে থাকে। যেমন– করাত মিলে গাছের গুড়ি ওঠানোর সময়, গভীর নলকূপ স্থাপনের সময়, বৈদ্যুতিক খুঁটি পোতার সময়, রাস্তা নির্মাণে কর্মরত শ্রমিকেরা ছন্দে ছন্দে গালি ব্যবহার করে, যা সভ্য সমাজে অশ্রাব্য। অথচ এর মাধ্যমে তাদের কর্মস্পৃহা অনেকগুণ বেড়ে যায় বলেই তাদের ধারণা।

১০. রাজনৈতিক গালাগাল

ইতিহাস, সাহিত্য কিংবা মিথের অনেক নেতিবাচক বা খলচরিত্রের নাম গালি হিসেবে ব্যবহৃত হয়; যেমন- হিটলার, ইয়াহিয়া খান, মীরজাফর ইত্যাদি। শুধু অমার্জিত ও উসকানিমূলক নয়, অশ্লীল ভাষাও অনেক নেতা-নেত্রী প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে ব্যবহার করেন। যা অনেকটা গালাগালের মাত্রা পায়। যেমন- রাজাকার, জঙ্গি, রাষ্ট্রদ্রোহী, রাষ্ট্রবিরোধী, স্বাধীনতা বিরোধী, আলবদর, আলশামস্ ইত্যাদি।

তবে এসব শব্দের প্রকৃত অর্থ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অনেক গভীর।

১১. সাহিত্যে গালাগাল

সাহিত্যে গালির ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কারো কারো সাহিত্যকর্ম অত্যধিক গালি ব্যবহারের কারণে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সাহিত্যিকদের হাত ধরে আমদানি হয়েছে হরেক রকমের গালি। যেমন, শেক্সপিয়ারের মাধ্যমে ইংরেজি ভাষায় যুক্ত হয়েছে অনেক নতুন গালি। Disfurnish, facinerious, barbary, cock-pigion, cabilero, miching-এর মতো গালি শেক্সপিয়ার তাঁর নাটকে প্রচুর ব্যবহার করেছিলেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, কায়েস আহমেদ, সমরেশ বসু প্রমুখ গালিকে বাংলা সাহিত্যে অলংকার বানিয়ে ফেলেছেন। বাংলা সাহিত্যে গালিগালাজের জন্যে অভিযুক্ত হয়েছেন তসলিমা নাসরিন, হুমায়ুন আজাদসহ অনেকেই। লক্ষ করা যায়, হারামজাদার চাকুরিটা ফিরিয়ে দেব যদি পঞ্চাশ লাখ দেয়; মাদারচোতটা দেবে, বাঞ্চতটা কয়েক বছরে কয়েক কোটি জমিয়েছে...।[৯] এরকম আরো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

১২. খেলাধুলায় গালাগাল

খেলাধুলাতেও গালির ব্যবহার লক্ষণীয়। বিপক্ষ খেলোয়াড়দের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক অস্থিরতা বা মনোযোগের বিঘ্ন ঘটানোর জন্য গালি ব্যবহার হয়। জনপ্রিয় খেলা ফুটবল থেকে শুরু করে ক্রিকেটেও গালির ব্যবহার লক্ষ করার মতো। গালাগালকে খেলার ভাষায় স্লেজিং বলা হয়। যেমন, একবার এক বোলার ব্যাটসম্যানকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'যদি তুমি ছক্কা মারতে পারো, তাহলে তুমি যা চাও তাই পাবে।' জবাবে ঐ ব্যাটসম্যান বলেছিলেন, 'যাও তোমার বউকে বিছানায় রেডি হতে বলগে'। আর অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট খেলোয়াড় সাইমন্ডস এবং ভারতের ক্রিকেট খেলোয়ার হরভজন একে অপরকে বানর বলে গালিগালাজ করার ব্যাপারটা তো সকলেরই জানা।

১৩. চলচ্চিত্রে গালাগাল

সম্প্রতি চলচ্চিত্রে গালির ব্যবহার দেখা যায়। সিনেমা এই দিক থেকে সবার উপরে। মাদার ফাকার, ফাক, সাকার, ব্লাডি হেল, ডিক ইত্যাদি শব্দগুলো ইংরেজি সিনেমায় গালি হিসেবে হরহামেশাই ব্যবহৃত হয়। বাংলা চলচ্চিত্রে একসময় অশ্লীল শব্দের ব্যবহার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। তবে বাংলা সিনেমায় শুধু ভিলেনদের মুখেই গালি শোনা যায়। যেমন- হারামজাদা, হারামখোর, হারামির বাচ্চা, খানকির ছেলে, শয়তান, শালা, শালার বেটা শালা, শালি, শালির বেটি শালি, মাগি, নটির মেয়ে/ছাওয়াল ইত্যাদি।

১৪. প্রাণিকেন্দ্রিক গালাগাল

গালাগালের সাথে অনেক সময় প্রাণিকুলকে টেনে আনা হয়। যেমন রাগের মাথায় কখনো প্রতিপক্ষকে শুয়োরের বাচ্চা, কুত্তার বাচ্চা বলা হয়। নির্বোধকে ছাগল বা গরু বা গাধা, ধূর্তকে শিয়াল, দুষ্টুকে বানর বলে গালি দেয়া হয়। আবার অকর্মাকে বলদ বলে গালি দেয়া হয়।

১৫. সমাজে গালাগালের প্রভাব

গালিতে ব্যবহৃত শব্দাবলি সামাজিকভাবে অকথ্য বা অশ্রাব্য হিসেবে পরিচিত। এ কারণেই অনেক সময় অভিযোগ শোনা যায় 'অমুক আমাকে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়েছে'। অর্থাৎ এমন কথাই বলা হয়েছে যা বলা যায় না। একইভাবে 'অমুক আমাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়েছে অর্থাৎ এমন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা শোনার অযোগ্য। এ কারণেই গালাগালের শব্দমালা বা বাক্যাবলি সহজাতভাবেই ঘৃণিত বা নিন্দনীয়। বাংলা ভাষায় গালাগালে ব্যবহৃত শব্দাবলির মধ্যে আঞ্চলিকতার ভিন্নতা রয়েছে। যেমন- পাবনা অঞ্চলে মেয়েদেরকে আদর করে মাগী নামে সম্বোধন করা হলেও খুলনাঞ্চলে মাগী শব্দটি পতিতা অর্থে ব্যবহার করা হয়। তাই পাবনার কেউ খুলনা বেড়াতে এলে আদর করতে গিয়ে গালি দেয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারেন। অমার্জিত, অরুচিকর, অশালীন ভাষা যখন একজন সাধারণ, অশিক্ষিত, নিম্নশ্রেণির মানুষ ব্যবহার করে, তখন তা বেশি গুরুত্ব পায় না। কিন্তু শিক্ষিত, অভিজাত ও নেতৃস্থানীয়দের মুখ থেকে অশ্লীল-অমার্জিত শব্দাবলি নির্গত হলে তা সমাজের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, তার প্রভাব পড়ে সাধারণ লোকজনের মাঝে। তারা যা করেন, ভাবেন ও বলেন এবং যেভাবে চলেন, অনেকেই এসব কিছু গ্রহণযোগ্য মনে করে এগুলো অনুসরণ করে থাকে।[১০] আর যখন রাজনীতির অঙ্গনে নেতানেত্রী বা দায়িত্বশীল উর্ধ্বতন ব্যক্তিরা অমার্জিত কিংবা উত্তেজক ও উসকানিমূলক শব্দ ও ভাষা ব্যবহার করেন, তখন ক্ষতিটা হয় আরো ব্যাপক। রাজনীতির এই অপভাষা জাতীয় জীবনে হিংসা, হানাহানি, অনাস্থা, অশান্তি, বিদ্বেষ ও বিভাজন বাড়িয়ে দেয়। এতে রাজনৈতিক অঙ্গনের সমস্যা প্রকট এবং পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে ওঠে। রাগের মতো সাধারণ আবেগটি যাতে অনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রকাশ না পায়, সে জন্য মার্কিন বিজ্ঞানী গার্লস স্পিয়েলবারগার রাগের নিয়ন্ত্রিত প্রকাশভঙ্গির কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর গবেষণায় তিনি বলেছেন, রাগকে পুরোপুরি চেপে রাখা যাবে না, একেবারে দমন করা যাবে না; কারণ অবদমিত রাগ থেকে হতে পারে নানাবিধ মানসিক ও শারীরিক সমস্যা; হতে পরে বিষণ্নতা, উচ্চরক্তচাপ, খিটখিটে মেজাজ, বিশ্বনিন্দুক চরিত্রের মালিক।[১১]

একাধিক মার্কিন গবেষণায় প্রমাণ মিলেছে মানসিক চাপ, অবসাদ, মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজনা কমানোর ক্ষেত্রে গালিগালাজ খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এই ধারণার সঙ্গে একমত ব্রিটিশ গবেষক এবং মনোবিজ্ঞানীরাও। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক ও ফলিত ভাষাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. কিরিকুস অ্যান্টনিও জানান, গালিগালাজ আসলে মন থেকে রাগ, ক্ষোভ বের করে মানসিক চাপ কমানোর সহজ উপায়। অ্যান্টনিওর মতে, যেসব মানুষ উত্তেজিত হলেও গালিগালাজ দিতে পারেন না বা দেন না, তাদের মধ্যে মানসিক অবসাদ, উচ্চরক্তচাপ, নানা স্নায়ুবিক সমস্যা দেখা যায়। শুধু তাই নয়, কখনো এসব ব্যক্তিদের মধ্যে দ্বৈত ব্যক্তিত্বের (split personality) সমস্যাও দেখা যায়। তুলনায় যারা সহজে গালাগাল দিয়ে চাপমুক্ত হন তারা অনেক বেশি সুস্থ থাকেন। .

গালি নিয়ে সমাজের শিক্ষিত মহলে বেশ অসন্তোষ দেখা যায়। কেউ কেউ মনে করেন, আইন করে জনসম্মুখে গালি নিষিদ্ধ করা উচিত। অনেকের ধারণা গালি ভাষার সৌন্দর্য ও পবিত্রতা নষ্ট করে।

সুতরাং তা ভাষা থেকে ছেঁটে ফেলা উচিৎ। যদি তাদের কথা মতো গালি নিষিদ্ধ করা হয় তাহলে কি ঘটতে পারে তা ভেবে দেখা দরকার। তবেই গালির প্রয়োজনীয়তা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। গালি কখনই ভাষার সৌন্দর্য নষ্ট করে না বরং তা আরও সুস্পষ্ট করে তোলে। ভাষাকে ক্ষেত্রবিশেষে করে তোলে প্রাণবন্ত ও সজীব। গালি না থাকলে সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটা হতো তা হল, মানুষে মানুষে দৈহিক হাঙ্গামা বহুগুণে বেড়ে যেত। মানুষ ভাষা বা অভিব্যক্তির মধ্যদিয়ে রাগ মেটাতে না পেরে একে অন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। হারামখোর, শুয়োরের বাচ্চা বলে যে কাজটি অনায়াসে হয়ে যায়, সেই কাজটি হতে হাতাহাতি বা লাঠালাঠি হতে পারে। এতে করে সামাজিক অস্বস্তি, অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা বেড়ে যেত কয়েকগুণ। তবে তার অর্থ এই নয় যে গালাগালকে উৎসাহ জোগাতে হবে। ক্রোধ প্রশমনের সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক-শৈল্পিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

১৬. উপসংহার

কোনো সমাজই সম্পূর্ণ সংঘাতমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ নয়। বাঙালি জীবনে গালির প্রয়োজনীয়তা ও ভূমিকা বলে শেষ করা যাবে না। গালাগাল সমাজের বিশৃঙ্খলাকে অনেকখানি রোধ করে। ফলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অনেকখানি বহাল থাকে। গালি আমাদের সমাজের এক মারাত্মক ব্যাধি। গালিগালাজ করা কোনো সুস্থ মানসিকতার পরিচয় নয়। মুদ্রাদোষ বা অভ্যাসবশত অনেকেই কথায় কথায় গালি দেন, অনেকেই হাসি-তামাশা ও ঠাট্টাচ্ছলেও অন্যকে গালি দিয়ে বসেন, এসবের কোনোটিই ঠিক আচরণ নয়। তাই গালাগাল পরিতাজ্য হলেও তা সামাজিকভাবে সৃষ্ট যার উপযোগিতার কারণেই প্রচলন বন্ধ করা কঠিন হবে বলেই মনে হয়।

তথ্যসূত্র

১. এ. কে. নাজমুল করিম, *সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ*, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৩৪

২. শাহেদ ইকবাল, গালির সামাাজিক ও নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, *ধ্বনি*, ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (গালি সংখ্যা), ফেব্রুয়ারি-২০১২, পৃষ্ঠা ১

৩. সৈয়দ আলী নকী ও মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *নৃবিজ্ঞান*, ঢাকা : ধানশীষ, জুন ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ১১৩

৪. *The Historical Dictionary of American Slang,* Vol.3, USA: Random Home, 1975

৫. স্যামুয়েল কোয়েনিগ, *সমাজবিজ্ঞান*, ঢাকা : বই বিতান, আগস্ট ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ২৫৪

৬. Logo: Literary Terms Dictionary, 1978

৭. K. G. Chesterton, *A Book of Essays,* 1931, P.314

৮. আহমেদ হেলাল, চট করে চটে যাওয়া, *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ৩ জানুয়ারি ২০১৮

৯. হুমায়ুন আজাদ, *পাক সার জমিন বাদ সাদ.* ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০৪

১০. মোজাফ্ফর হোসেন, ভাষার ব্যবহার ও গালির ম্যারপ্যাচ, *রাইজংবিডি.কম*, ঢাকা : ২০ মে ২০১৭

১১. K. G. Chesterton, *A Book of Essays*, 1931, Page 321